জানা-অজানা পুলিশ কাহিনী–দুই

সনতোষ বড়ুয়া

পুলিশ নিয়ে অনেক অভিযোগ ও তিক্ততা আমাদের। তবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ নিপীড়ক যন্ত্রের একটি খন্ড, আর ব্যক্তি পুলিশ এই সমাজেরই নানাপ্রান্তের মানুষ। এই ধারাবাহিক লেখায় পুলিশ বাহিনীর ভেতরের জগত তুলে ধরছেন এক সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা।

পুলিশের ওপরও পুলিশ আছে, ছত্রিশ ঘার ওপরও ঘা আছে

বাংলাদেশে যে প্রবচনটি বহুল প্রচারিত সেটা হলো 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা'। অর্থাৎ পুলিশ বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। আসলে কি তাই? যদি তা-ই না হয় তাহলে একথা প্রচারিত হলো কেন? কোনো কোনো পুলিশের আচরণ নিশ্চয় বাঘের চেয়েও খারাপ, তবে সব পুলিশের নয় কোনোমতেই। পুলিশের সকল সদস্য যেহেতু একটি বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করে, তাই কোনো একজনের খারাপ কাজের দায়দায়িত্ব গিয়ে পড়ে পুরো বাহিনীর ওপরই। কিন্তু কোনো অফিসার যদি কোনো ভালো কাজ করেন, সেটা হয়ে পড়ে তাঁর একার কৃতিত্ব। একথার অবতারণা করলাম এজন্য যে এই বাঘের চেয়ে ভয়ংকর প্রাণীর ওপর যারা খবরদারি করে, করতে পারে, তারা তাহলে নিশ্চয়ই আরো বেশি ভয়ংকর! এরা কারা?

এরা হলো ক্ষমতাসীন দলের নেতা, পাতিনেতা। যারা যখন ক্ষমতায় থাকে তারাই পুলিশের ওপর খবরদারি করতে চায়। কেন এবং কিভাবে করতে চায় সে বিষয়ে আজ আলোচনা করব। তবে দেশে মাঝেমধ্যে যখন সিভিল সরকার ক্ষমতায় থাকে না, তখন এসব নেতার যে খবরদারি কমে আসে শুধু তা-ই নয়, এসব নেতা পারলে তখন পুলিশের টেবিল বা চেয়ারের নিচেই লুকায়। সে সময় অবশ্য অন্য রকম এক জাতীয় খবরদারি পুলিশের ওপর চলে। সেটা দেশের মানুষ জানে। দেখা যায় সেসব বিশেষ সময়ে থানা এলাকার টাউট-বাটপাড়রা থানা ছেড়ে থানা এলাকায় স্থাপিত ক্যাম্পে গিয়ে ভিড় জমায় এবং এলাকার নানাজনের বিরুদ্ধে নানা কথা লাগিয়ে নানাজনকে হয়রানি করে। এসব আমার দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এখন আসি পুলিশের ওপর খবরদারি বিষয়ে। ২০০০ সালে আমি তখন সিএমপিতে চাকরি করছি। একদিন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরের মোড়ে একটা মোটরসাইকেল থামিয়ে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে বললাম যুবককে। যুবক কোনো কাগজই দেখাতে পারল না, পকেট থেকে সেলফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল এবং সেই ফোনে আমাকে কথা বলার জন্য বলল। জিজ্ঞাসা করলাম, কে? কার সাথে কথা বলব আমি? যুবক জানাল, তাদের ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আইনবিষয়ক সম্পাদক। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, আমি তাঁর সাথে কথা বলব কেন? যেহেতু বাইকের কাগজপত্র নেই, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, সেহেতু বাইক জব্দ করলাম এবং থানায় নিয়ে গেলাম। এই কাজ যুবক কেন করল? করল এজন্য যে সে জানে পার্টির সিনিয়র কোনো নেতার সাথে কথা বলিয়ে দিলে পুলিশ তার বাইক আর জব্দ করবে না, ছেড়ে দেবে। এভাবে ছোট ছোট নেতা আইন অমান্য করা শিখতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, এ ধরনের ঘটনায় অনেক সিনিয়র নেতা পুলিশের সিনিয়র অফিসারকে ফোন করে আর সিনিয়র অফিসার সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ফোন করে আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বলেন। প্রায়ই দেখা যায়, পুলিশ নেতাদের কথা শুনছে, আসামি ছেড়ে দিচ্ছে। এখন যদি আপনি নেতার তদবির না শোনেন, নেতা কী করবেন? নেতা তখন আপনার বিরুদ্ধে জেলার অথবা কেন্দ্রের নেতাকে জানাবেন যে অমুক পুলিশ অফিসার তাঁদের নেতাকে কথায় কথায় গালি দেন, সব সময় তাঁদের পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করেন, বিরোধী দলের নেতার সাথে সম্পর্ক রাখেন। ফলাফল–খারাপ জায়গায় বদলি। সুতরাং বেশির ভাগ পুলিশ অফিসারই এসব ঝামেলায় যেতে চান না।

যদি আপনি নেতার তদবির না শোনেন, নেতা কী করবেন? নেতা তখন আপনার বিরুদ্ধে জেলার অথবা কেন্দ্রের নেতাকে জানাবেন যে অমুক পুলিশ অফিসার তাঁদের নেতাকে কথায় কথায় গালি দেন, সব সময় তাঁদের পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করেন, বিরোধী দলের নেতার সাথে সম্পর্ক রাখেন। ফলাফল–খারাপ জায়গায় বদলি। সুতরাং বেশির ভাগ পুলিশ অফিসারই এসব ঝামেলায় যেতে চান না।

২০০৯-১০ সালে আমি চাঁদপুরের কচুয়া থানায় কর্মরত ছিলাম। আমি সে সময় চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য কচুয়া থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রেস্টুরেন্ট 'হাইওয়ে ইন'-এ আসতাম, তারপর ওখান থেকে বাসে উঠতাম তাড়াতাড়ি এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য। তো কচুয়ায় আওয়ামী লীগের সবাই যে আমাকে পছন্দ করত তা নয়। আর ক্ষমতাসীন দলের সবাইকে সন্তুষ্ট করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সব রাজনৈতিক দলেই স্থানীয় গ্রুপিং আছে। নির্বাচিত এমপি সাহেবেরও পক্ষে-বিপক্ষে নিজের দলেই লোকজন থাকে, যদিও সামনাসামনি প্রকাশ পায় না অনেক কিছু। আমি একদিন ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। যথারীতি এসে পৌঁছেছি 'হাইওয়ে ইন' রেস্টুরেন্টে। এমন সময় এমপি মহোদয়ের ফোন পেলাম। তিনি আমাকে জানালেন, এলাকার কেউ একজন তাঁকে ফোন করে জানিয়েছেন যে আমি কুমিল্লার কোনো এক হোটেলে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সাথে বৈঠক করছি। আমি জানালাম যে আমি বাড়ি যাওয়ার পথে বাসের অপেক্ষায় আছি। জনাব মহীউদ্দীন খান আলমগীর আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন। বললেন–যাও, ঘুরে এসো বাড়ি থেকে। আমি তোমার বিরুদ্ধে ওইসব ফোনের কথা বিশ্বাস করি না। বুঝলাম উপজেলায় 'ওসি' আর 'টিএনও'র বিরুদ্ধে কোনো না কোনো গ্রুপ সব সময় সক্রিয় থাকে।

শুনেছিলাম, ১৯৯০ সালে পুলিশের এক এসআই সিলেটে একজন মোটরসাইকেল আরোহীর বিরুদ্ধে মোটরযান আইনে মামলা দেওয়ায় সেই অফিসারকে বান্দরবান জেলায় বদলি করেছিলেন তৎকালীন ডিআইজি। কারণ সেই বাইক আরোহী ছিলেন ডিআইজির আত্মীয়। পুলিশে চাকরি করার সময় এসব অনেক দেখেছি। আমরা পুলিশের আইন প্রয়োগ হোক সেটা চাই, কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজন বা নিজের পার্টির লোকের বিরুদ্ধে কিছুতেই নয়। আগের কিস্তিতে লিখেছিলাম যে পুলিশ নিজের ভালো পোস্টিংয়ের জন্য আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গিয়ে তদবির করে, না হয় পোস্টিং সম্ভব নয়, এটাই এখন চলমান পোস্টিং সংস্কৃতি। ফলে নেতাও

চান প্রতিদান, প্রতিদান হলো পুলিশ যেন নেতার কথামতো চলে। পুলিশকে আজ নেতাদের কথামতো চলতেই হয়, আইনের কথামতো চলার শক্তি হারাচ্ছে পুলিশ, কারণ মেরুদণ্ডহীন রাজনীতি মেরুদণ্ডহীন পুলিশ তৈরি করে।

এই পথে আর কে কে?

পুলিশের ওপর লাঠি ঘোরানোর লোক আরো আছে। সে হলো সাংবাদিক (তবে ক্যাটাগরি ভাগ আছে)। ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের মফস্বল এলাকায় পর্যন্ত এসব সাংবাদিকের দেখা মেলে। এসব সাংবাদিক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার থেকে থানা পর্যায়ের নানা অফিসারের সাথে সম্পর্ক রাখে। এই সম্পর্ক রেখে নানা পথে আয়-রোজগার করা হলো তাদের কাজ। সাংবাদিকের এই আয়-রোজগারে কোনো পুলিশ অফিসার কোনো সাংবাদিকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালে তখন সেই পেপারে ছাপানো হয় সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে নানা কাহিনী (তবে পুলিশের বিরুদ্ধে ছাপানো সব রিপোর্ট এই ধরনের নয়)। ১৯৯৮ সালে আমি মহেশখালী থানায় সেকেন্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। একদিন দেখলাম, ওসি সাহেব কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছেন আর বলছেন তাঁর এত টাকা নেই, তিনি পারবেন না। ফোনে কথা শেষ হলে আমি জানতে চাইলাম, কী বিষয়? ওসি সাহেব জানালেন কক্সবাজার থেকে সাংবাদিক 'ক' ফোন করেছিলেন, তাঁর লাউক্কা শুঁটকি প্রয়োজন। (এই সাংবাদিক তখন ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার, নাম প্রকাশ করলাম না) তখনই এই শুঁটকির দাম ৫-৬ হাজার টাকার কম নয়। ওসি সাহেব অপারগতা প্রকাশ করেন এবং তিনি সেই সাংবাদিককে লাউক্কা শুঁটকি কিনে দেননি। এর পরের সপ্তাহে সেই সাংবাদিকের পেপারে (ঢাকা থেকে প্রকাশিত) বড় হেডলাইনে রিপোর্ট ছাপা হলো, 'মহেশখালী চ্যানেল দিয়ে বার্মা থেকে অবৈধ অস্ত্র এবং মালামাল পাচার, পুলিশ দেখেও দেখছে না'। এ ধরনের রিপোর্ট সাধারণত মনগড়া হয়, কারণ বাস্তব তথ্যের চেয়ে কল্পনার ওপর ভর করতে হয় বেশি। সাংবাদিক এ ধরনের সংবাদে সব সময় নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে সব তথ্য সরবরাহ করে থাকেন, আর তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রের নাম বলতে বাধ্যও নন। এ ধরনের সংবাদে হয় কী? দেশের সাধারণ পাঠক পুরোটাই বিশ্বাস করেন এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা জানতে চায়। যেকোনো প্রকারের গৃহীত ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দিলেই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স সন্তুষ্ট।

ওসি সাহেব অপারগতা প্রকাশ করেন এবং তিনি সেই সাংবাদিককে লাউক্কা শুঁটকি কিনে দেননি। এর পরের সপ্তাহে সেই সাংবাদিকের পেপারে (ঢাকা থেকে প্রকাশিত) বড় হেডলাইনে রিপোর্ট ছাপা হলো, 'মহেশখালী চ্যানেল দিয়ে বার্মা থেকে অবৈধ অস্ত্র এবং মালামাল পাচার, পুলিশ দেখেও দেখছে না'।

ঢাকা থেকে এক সাংবাদিক আসতেন বিভিন্ন থানায়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অনেক সিনিয়র অফিসারের সাথে তাঁর ওঠাবসা। তিনি থানায় এসেই সেসব গল্প করতেন। দেখা যেত, যেসব অফিসার ঘুষ খান না তাঁদের সাথে ওইসব ধান্দাবাজ সাংবাদিকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। যাঁর কথা বলছি তিনি 'ক্রাইম'বিষয়ক একটা ম্যাগাজিন এক শ/দেড় শ কপি ছাপাতেন। আর সেটা দেখিয়ে বিভিন্ন থানা থেকে বিজ্ঞাপন জোগাড় করতেন লাখ লাখ টাকার। কিন্তু কিভাবে? উপায় সহজ। পুলিশের সাথে সম্পর্ক থাকে নানা ব্যবসায় উঠতি ধনী ব্যবসায়ীদের। নানা প্রকার দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদেরও সম্পর্ক থাকে নানা পুলিশ অফিসারের। পুলিশের কতিপয় সদস্য এসব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের নামে হাজার হাজার টাকা তুলে ওইসব বস্তাপচা সাংবাদিককে দেন। ফলাফল কী? ফলাফল এই যে পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেওয়া পুলিশ অফিসারের নামে বিরাট আকারের প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপানো হয়, যাতে দেখা যাবে ওই পুলিশ অফিসারের জন্য পুলিশ বাহিনী ধন্য, কারণ তাঁর মতো সৎ, ন্যায়পরায়ণ অফিসার আর পুলিশ বিভাগে দ্বিতীয়টি নেই। আমি যেসব এলাকায় চাকরি করেছি–সিএমপি, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী–সব জায়গায় এসব সাংবাদিকের উপস্থিতি টের পেয়েছি। ঢাকার অনেক বহুল প্রচারিত পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতাকেও দেখেছি এসব ধান্দাবাজি করতে। কোনো ঈদ বা পার্বণে দেখা যেত কয়েকজন পুলিশ অফিসার অনেক পাঞ্জাবি কিনছেন, কারণ তিনি এসব দামি পাঞ্জাবি সাংবাদিকদের দেবেন, যাতে তাঁর অপকর্মের কোনো রিপোর্ট পেপারে না যায়। কিন্তু গরিব, নিঃস্ব মানুষের মাঝে তেমন কিছু দান করা হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুলিশের ওপরও পুলিশ আছে, ছত্রিশ ঘার ওপরও ঘা আছে।

পুলিশের গাড়ি

১৯৮৯ সালে আমি যখন থানায় চাকরি শুরু করি, তখন দেশের বেশির ভাগ থানায় সরকারি গাড়ি ছিল না। স্থানীয়ভাবে গাড়ি রিকুইজিশন বা ডেকে এনে রাতের রন পাহারা, দিনের কাজ, তদন্তে যাওয়া ইত্যাদি সম্পন্ন করা হতো। ১৯৯০-৯১ সালে থানায় পিকআপ ভ্যান বরাদ্দ দেওয়া শুরু হয়। তা-ও প্রতিটি থানায় একটা। কিন্তু রাতে প্যাট্রোল পার্টি বের হতে হয় কয়েকটি। তাহলে উপায়? উপায় স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা গাড়ি। কিন্তু জ্বালানি? জ্বালানি কে দেবে? সরকার দেয় না। একটি গাড়ি বরাদ্দ, জ্বালানিও একটি গাড়ির। বাকি জ্বালানি যার যার তার তার। যে প্যাট্রোল ডিউটিতে যাবে জ্বালানিও তার। এভাবে চলছে এখনো। কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, অলিখিত আদেশ হলো 'ম্যানেজ করো'। এই ম্যানেজ করতে গিয়ে পুলিশকে ছোট হতে হয় স্থানীয় গাড়ি মালিক সমিতির কাছে। শুধু ছোট হওয়া নয়, আপোস করতে হয় রেজিস্ট্রেশন, পারমিটবিহীন গাড়ির সাথেও। পুলিশ আপদে-বিপদে পাবলিকের গাড়ি ব্যবহার করবে আবার রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে মামলাও দেবে, তা তো হয় না।

থানায় পিকআপের জন্য যে পরিমাণ জ্বালানি বরাদ্দ থাকে তা দিয়ে মাসের অর্ধেক সময়ও কুলায় না। বাকি সময় ম্যানেজ করতে হয়। এই ম্যানেজ করতে করতে পুলিশ আর দাঁড়াতেই পারে না। পুলিশের পাশাপাশি কাজ করা অন্য কোনো বাহিনী নিজের টাকায় যানবাহনের জ্বালানি কিনে ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। আবার মাঝে মাঝে যদি থানা এলাকায় কোনো ভিভিআইপি বা ভিআইপি অতিথি আসেন তাহলে অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। কারণ সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি কেউ আর দেয় না, সেটাও যায় থানার মাসিক বরাদ্দ থেকে। এখন তো থানায় থানায় মামলার তদন্ত ব্যয় থেকে শুরু করে মামলা লেখার কাগজ-কলমও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। থানার ওসির নামে সরাসরি বরাদ্দ যায়, ওসি সেই টাকা ব্যয় করেন। ফলে মানুষের কাছ থেকে চাওয়ার দায় একটু কমেছে বলা যায়। যদি না কমে থাকে দোষ আর সরকারের নয়, দোষ পুলিশেরই। এই বরাদ্দের আগে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে স্টেশনারি সামগ্রী থানায় পাঠানো হতো, সেই সামগ্রী কোনো দিনও অফিস সহকারীকে উপরি না দিয়ে থানায় আনা হয়েছে তেমন মনে পড়ে না। সেই পরিস্থিতি এখন বদলেছে বলা যায়।

তবে পুলিশের যানবাহন সমস্যা যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নয়।

এখনো দেখা যাবে, রাতে বা দিনে বিভিন্ন থানায় পুলিশ দল ভাড়া করা বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা গাড়ি দিয়েই কাজ সারছে। এটা পুলিশের জন্য বিব্রতকরও বটে। কারণ স্থানীয় গাড়ির মালিকরা অনেক সময় গাড়ি দিতে চায় না, সে অধিকার অবশ্য তাদের আছে। এটাও সরকারের দেখা জরুরি যে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল বাহিনী পুলিশ চলছে রিকুইজিশন করা লক্কড়ঝক্কড় গাড়িতে আর পুলিশের মতো আরেকটি বাহিনী চলছে দ্রুতগতির আধুনিক গাড়িতে–সেটা ঠিক নয়, সেটা বৈষম্য। বৈষম্যে মনোবল বাড়ে না।

কিন্তু জনগণ তো পুলিশের পুরো সেবাটাই চায়। কোনো বিপদের সময় মানুষ যখন থানায় ফোন করে তখন তারা আশা করে ঘটনাস্থলে অনতিবিলম্বে পুলিশের উপস্থিতি। কিন্তু যানবাহন জোগাড় করতেই যদি অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায় তাহলে ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছবে কিভাবে? শহর বা মেট্রো এলাকায় এ সমস্যা কিছুটা কম হলেও গ্রামের থানা এলাকায় এই সমস্যা এখনো প্রকট। তখন করা হয় কি, যারা পুলিশ নেওয়ার জন্য থানায় আসে তাদেরই বলা হয় গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসার জন্য, যা মোটেও মানবিক বিষয় নয়। কিন্তু এটাই আমরা করেছি, এখন যারা চাকরি করছে তারাও করছে।

এছাড়া রাতের বেলায় গ্রামের থানা এলাকায় আসামি ধরতে যাওয়া শুধু কষ্টসাধ্য নয়, ব্যয়সাধ্যও বটে। কারণ গাড়ি ভাড়া করে আসামি গ্রেপ্তারের জন্য গেলেই যে আসামি পাওয়া যাবে তা নয়। যদি পাওয়া না যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার গাড়ির ভাড়া দেবে কে? ফলে দেখা যায়, থানার অফিসাররা একই আসামিকে বারবার গ্রেপ্তার করার জন্য যায় না। আর বারবার যেতে হলে মামলার বাদীকেই সেই খরচ বহন করতে হয়। শহরের বা মেট্রো এলাকার থানাগুলো বিশাল এলাকার নয়, যে রকম বড় বড় এলাকা নিয়ে গ্রামের থানাগুলো। তাছাড়া গ্রামের অনেক থানার কিছু কিছু এলাকায় যে কী রকম খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমি যখন বড়লেখা থানায় চাকরি করি, তখন সেই থানা এলাকায় কোনো কোনো গ্রামে গাড়ির রাস্তাই ছিল না। শাহবাজপুরে রাস্তা ছিল বড় বড় বোল্ডার পাথরের, ফলে সেই রাস্তায় গাড়ি চলত না। যেতে হতো ট্রেনে। কুলাউড়া থেকে এখনো একটা ট্রেন শাহবাজপুরে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত যায়। সেই ট্রেন আবার ফিরে আসে ভোরে। আমরা সেই ট্রেনে শাহবাজপুর গিয়ে আসামি গ্রেপ্তার অভিযান শেষ করে আবার সেই ট্রেনে ফিরে আসতাম । আর যদি বোবারথল যেতাম তাহলে ছোটলেখা চা বাগান থেকে পুরো পথই হেঁটে। পুরোটাই উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ। বোবারথল যাওয়া পুলিশের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল বলে এলাকার বিভিন্ন দাগি আসামি লুকিয়ে থাকত সেখানেই। তাছাড়া বোবারথলে যে এলাকায় দাগি আসামিরা লুকিয়ে থাকত, সেই স্থানটি ভারতের সাথে আমাদের 'ডিসপুট' ল্যান্ড। নাম হলো লাঠিটিলা। সেখানে রাতের আঁধারে প্রবেশ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা সেখানে গেলে পথে স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পে অবহিত করে যেতাম। যদি কোনো সমস্যা হয় পুলিশের সাহায্যে মুভ করবে বিডিআর। সেখানে যাওয়ার পথে কখনো দুর্বল হয়ে পড়লে জিরিয়ে নিতাম সেই বিডিআর ক্যাম্পে। এসব এলাকায় চাকরি করলে সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক খুবই জরুরি। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার থানা পুলিশের সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্পর্ক ভালো থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখনই সীমান্ত এলাকার থানায় চাকরি করেছি, সেই সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ রাখার চেষ্টাই করেছি।

> এই ম্যানেজ করতে গিয়ে পুলিশকে ছোট হতে হয় স্থানীয় গাড়ি মালিক সমিতির কাছে। শুধু ছোট হওয়া নয়, আপোস করতে হয় রেজিস্ট্রেশন, পারমিটবিহীন গাড়ির সাথেও।

পুলিশকে ডাকাত বলে রাতের আঁধারে ঘেরাও এবং সংবাদপত্রের সংবাদ

১৯৯২ সালে আমি মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানায় কর্মরত ছিলাম। এক রাতে বড়লেখা থানার বহ্নি এলাকায় হাওরের মধ্যে হত্যা মামলার আসামি ধরতে যাই। কিন্তু আসামি গ্রেপ্তার করে ফিরে আসার সময় পথে আমাদেরকে 'ডাকাত ডাকাত' বলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে এলাকার লোকজন ঘেরাও করে ফেলে। আমরা এলাকার লোকজন দ্বারা আক্রান্ত হই, কিন্তু রাতের বেলা হওয়ায় আমি কোনোমতেই পুলিশ দলকে গুলি করার আদেশ দিইনি। একসময় স্থানীয় এক বিএনপি নেতা আমাকে চিনতে পারেন এবং আমাদের দলকে ঘটনাস্থলের পাশে একটা বাড়িতে নিয়ে বসান। পরদিন ভোরে থানার ওসি সাহেব আরো পুলিশ নিয়ে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। পুলিশ আটকের বিষয়ে পরে আমি মামলাও দায়ের করি।

ঘটনা হতে পারে রাতের বেলায় ভুল বোঝাবুঝি অথবা ইচ্ছাকৃত। এতসব জানার পরও ঢাকার পেপারে এবং নানা প্রকার রংচটা ম্যাগাজিনে সংবাদ আসে, 'বড়লেখায় ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশ আটক'। অথচ ঘটনার সময়ই স্থানীয় একজন নেতা পুলিশ দলকে চিনতে পারেন এবং একজনের বাড়িতে নিয়ে বসান। তাহলে পরদিন স্থানীয় সাংবাদিকরা কার প্ররোচনায় এক ডাহা মিথ্যা সংবাদ ছাপাল? সাংবাদিক তো রিপোর্ট করতে পারত যে রাতের বেলায় পুলিশকে চিনতে না পারায় এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সারা দেশের পাঠক তো সেই প্রকাশিত ঘটনাই সত্য মনে করল। এর পর থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে ছাপানো সব ঘটনা আমি আর বিশ্বাস করি না।

আর মিথ্যা সংবাদ ছাপালেও রিপোর্টারের কোনো অসুবিধা হয় বলে তো মনে হয় না। এ বিষয়ে আরো এক ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৯৮ কি '৯৯ সালের কথা। আমি তখন মহেশখালী থানায় কর্মরত। সে সময় সারাদেশে ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে মহেশখালী থানা এলাকায় একটি পাহাড়ের মাঝখানে ফাটল ধরে এবং খেলাধুলা করার সময় ভূমিকম্প হওয়ায় ছোট দুটি ছেলেমেয়ে সামান্য আহত হয়। কিন্তু জনকণ্ঠের কক্সবাজার সংবাদদাতা (স্টাফ রিপোর্টার) সংবাদ পাঠান যে ভূমিকম্পে দুজন নিহত, আহত অনেক। আমি সংবাদদাতাকে জানালাম, মহেশখালীতে কেউ মারা যায়নি, আপনি না জেনে সংবাদ পাঠিয়েছেন। সংশোধনী পাঠান। তিনি আমাকে জানালেন যে সংশোধনীর দরকার নেই, মারা গেছে লিখলে সাহায্য পাওয়া যাবে বেশি। এই যদি কোনো স্টাফ রিপোর্টারের লজিক হয়, তাহলে আর কী বলব?

পুলিশের আচরণ

আমি তখন রাঙামাটির কাউখালী থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। বগাপাড়া থেকে স্থানীয় এক ইউপি মেম্বার থানায় আসেন এক ফরিয়াদিকে সাথে নিয়ে। আমি দুজনকে আমার সামনে রাখা চেয়ারে বসিয়ে তাঁদের অভিযোগ শুনি। তাঁরা চলে যাওয়ার পর মেম্বার আবার ফিরে আসেন। এসেই আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যেন সবাইকে আমার সামনে রাখা চেয়ারে বসতে না দিই। এতে থানা সম্পর্কে এলাকার লোকজনের ভয় ভেঙে যাবে। আমি মেম্বারকে জানিয়েছিলাম, থানায় চেয়ারগুলো দেওয়া হয়েছে থানায় আসা লোকজনের বসার জন্য। মেম্বার তার পরও বলে গেলেন, মেম্বারের সাথে আসা লোকজনকে মেম্বারের সাথে বসতে দেওয়া ঠিক হয়নি। বুঝতে পেরেছিলাম, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মানসিক অবস্থাও সুখকর নয়।

মানুষ যখন খুবই বিপদগ্রস্ত থাকে তখন পুলিশ ও ডাক্তারের কাছে যায়। বিপদের মুখোমুখি আবস্থায় থাকা মানুষের সাথে যদি পুলিশ ও ডাক্তার ভালো আচরণ না করে তাহলে মানুষ শুধু বিরক্ত নয়, ফুঁসেও উঠতে পারে। দেশের সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে কী রকম আচরণ আশা করে সেটা অনুধাবন করাই মূল বিষয়। আমি যে পুলিশে চাকরি করাকালে সব সময় থানায় আসা লোকজনের সাথে ভালো আচরণ করেছি তা নয়। কিন্তু একটা বিষয় সব সময় বলতাম–মানুষ বড় বিপদে না পড়লে থানায় আসে না (সব সময় যে বিপদে পড়ে আসে তা নয়, মাঝে মাঝে অন্যকে বিপদে ফেলার জন্যও আসে)। আমার কেন জানি মনে হয়, থানায় আসা লোকজনের সাথে যথাসম্ভব ভালো আচরণ করা দরকার। কিন্তু প্রায় সময় থানায় আসে টাউট আর বাটপাড়রা। এদের সাথে ভালো ব্যবহার করার তেমন দরকারও নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন থানায় এসে পুলিশের ভালো আচরণ না পায়, তখন তারা সাথে সাথে সেই আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে না, মুখে কষ্টমাখা হাসি নিয়ে চলে যায়, কিন্তু পরে তারা পুলিশের সেই আচরণের বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করে। একজন চিকিৎসক যদি রোগীর সাথে ভালো আচরণ করে তাহলে সেই রোগীর অসুখ অর্ধেক এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। সে রকম থানায় আসা মানুষের প্রতি যদি পুলিশ একটু সহৃদয় আচরণ করে তাহলে কাঙ্ক্ষিত কাজ না হলেও সেই লোক অনেকটা সন্তুষ্ট থাকে। বিপদে পড়া মানুষকে একটু আশ্বস্ত করতে পারাটা বিরাট বিষয়, যেটা আমরা পারি না। এই না পারার কারণটা আসলে কী?

আমার মনে হয়, পুলিশের ভালো ব্যবহার না করার পেছনে যে কয়টি কারণ সবচেয়ে বেশি দায়ী তার মধ্যে অন্যতম হলো ঔপনিবেশিক মানসিকতা। ব্রিটিশ শাসনের সময় এদেশে সরকারি অফিসাররা ছিল সব বিদেশি। আমরা ছিলাম অভাগা। তারা আমাদের সাথে কখনোই ভালো ব্যবহার করত না। তারা শাসক, আমরা শাসিত। আমার পূর্বপুরুষরা সেটা দেখেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা যখন অফিসার হলাম, আমরা সেই পুরনো দিন আর ভুলিনি। আমরাও নিজেদের মধ্যে শাসক আর শাসিত শ্রেণি বানিয়ে নিলাম। এবং ব্রিটিশদের মতো শাসক সেজে নিজের দেশের জনগণের সাথে অশোভন আচরণ করা শুরু করলাম। ভাবটা এরকম–আমি অফিসার, তোমরা আমাদের দেখলেই সালাম দেবে, সেবা করবে। জনগণও মেনে নিয়েছে সেভাবে। একবার পত্রিকায় পড়েছিলাম, আমার এক সহকর্মী ওসিকে স্থানীয় এক লোক সালাম না দেওয়ায় ওসি নাকি সেই লোককে গালমন্দ করে থাপ্পড় মেরেছে। সেই ওসি যে কত বড় অপরাধ করেছে সেটা চিন্তাই করা যায় না। এতেও জনগণ বুঝতে পারে কোনো কোনো পুলিশের মানসিকতা। পুলিশে কর্মরত সব পুলিশের ব্যবহার কখনোই খারাপ নয়। কিন্তু বেশির ভাগ পুলিশের ব্যবহার খারাপ হওয়ায় মানুষ আর পুলিশকে ভালো বলতে চায় না। এই মানসিকতা পরিবর্তন দু-এক দিনে সম্ভব নয়। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে পুলিশের আচরণও পরিবর্তন সম্ভব নয়। ক্ষমতাসীন নেতারা কথায় কথায় পুলিশের ওপর খবরদারি দেখাবেন আবার ভালো আচরণও আশা করবেন তা তো হয় না। এই খবরদারি দেখানোর বিষয়টা যখন স্থানীয় পাতিনেতারা দেখে তখন তারা বুঝতে পারে, পুলিশ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা লোকদের আসলে কিছুই করতে পারে না। তাই দেখা যায়, স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সরকার বদলের সাথে সাথে দলও বদল করে। তারা সব সময় সরকারি দলে থাকতে চায়। সরকারি দলও তাদের যোগদানে গৌরব (!) বোধ করে। তাছাড়া সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আজ কোনো প্রতিষ্ঠানেই জনগণ আর ভালো ব্যবহার পাচ্ছে না। কিন্তু সরকারি দলের নেতা আর সন্ত্রাসী গেলে ঠিকই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সবাই। সমাজের ভালো লোকদের সাথে স্থানীয় কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীই আর ভালো ব্যবহার করছে না। এই পরিবর্তনের জন্যও অসুস্থ রাজনীতি দায়ী, দায়ী দেশের রাজনীতি। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা করলে সরকারি কোনো বাহিনীরই ক্ষমতা নেই আইন ব্যতিরেকে নিজের ইচ্ছামতো চলে।

পুলিশের অঘটন, অঘটনের পুলিশ

মাঝে মাঝে বাংলাদেশ পুলিশের কিছু কিছু সদস্য এমন ঘটনা ঘটিয়ে বসে যে পুরো পুলিশ বাহিনীর সুনাম ধুলায় মিশে যায়। একজন শিক্ষক যদি ধর্ষণ করেন, ঘুষ খান বা একই কাজ যদি কোনো সরকারি-বেসরকারি অন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী করেন তাহলে সেই দোষ, দায়িত্ব একান্ত যাঁর যাঁর। কিন্তু কোনো বাহিনীর সদস্য যদি এ ধরনের গর্হিত কোনো কাজে জড়িত হয় তখন সেই অকাজের দায়দায়িত্ব গিয়ে পড়ে পুরো বাহিনীর ওপর। সে কারণে বাহিনীর সদস্যদের অত্যন্ত সজাগ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

পুলিশের বিষয়ে যদি বলি, দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সময় আমিও পুলিশে ছিলাম। কয়েকজন দুশ্চরিত্র পুলিশের জন্য অশান্ত হয়েছিল দিনাজপুর জেলা। মারা গিয়েছিল কয়েকজন, আহত হয়েছিল অনেক। শুধু তা-ই নয়, পুলিশের যেসব সদস্য এসবের কিছুতেই জড়িত ছিল না, আক্রান্ত হয়েছিল তাদের পরিবার-পরিজনও। সে সময় দিনাজপুর থানার দায়িত্বে ছিল আমার ব্যাচের মাহতাব। আমাদের '৮৮ ব্যাচের সবচেয়ে ভালো ও ভদ্র ছেলে সে। আমরা যে কজন ভার্সিটিতে পড়ে পুলিশে যোগ দিয়েছিলাম সে ছিল তাদের অন্যতম। সে রাজশাহী ভার্সিটির ছাত্র ছিল। অথচ হলো কি, 'ল্যাক অব সুপারভিশন'-এর কারণে চাকরি গেল জেলার এসপি এবং ওসির দায়িত্বে থাকা মাহতাবের। সে অবশ্য অনেক দিন পর চাকরি ফিরে পেয়েছিল। সে কারণে আমি যখন বিভিন্ন থানায় দায়িত্ব পালন করেছি তখন অধীনস্থদের কাজকর্ম নিয়ে খুবই সজাগ থাকতাম। না হয় তাদের কারো অপকর্মের ফল তো ভোগ করতে হতো আমাকেও। কারো কোনো অভিযোগের বিষয় আমার গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে আমি বিষয়টা জিডি করে জেলার এসপিকে অবহিত করতাম, প্রয়োজনে বদলি করার ব্যবস্থা করতাম। যেসব অফিসার এসব খেয়াল করেন না তাঁদের ইউনিটের কেউ কেউ ধীরে ধীরে বড় অঘটনে জড়িয়ে পড়ে। এবং একদিন তার বিস্ফোরণ হয়। এই যে দেশে হঠাৎ হঠাৎ কোনো কোনো পুলিশ সদস্যের কাজে পুলিশের দুর্নাম হচ্ছে, সেটা এক দিনের পরিণতি নয়, বাড়তে বাড়তে একদিন প্রকাশ হচ্ছে মাত্র।

> আসামি গ্রেপ্তার করে ফিরে আসার সময় পথে আমাদেরকে 'ডাকাত ডাকাত' বলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে এলাকার লোকজন ঘেরাও করে ফেলে। আমরা এলাকার লোকজন দ্বারা আক্রান্ত হই

সম্প্রতি সংবাদপত্র ও টিভিতে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ হচ্ছে সেটা হলো মাসুদ সিকদার নামের একজন এসআই বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার গোলাম রাব্বীকে কোনো কারণ ছাড়াই রাতের বেলা রাস্তা থেকে উঠিয়ে থানায় নিয়ে মারধর করে এবং টাকা দাবি করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। যার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পুলিশের আইজি বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন অভিযুক্ত এসআইর শাস্তি চেয়ে, যা পুলিশের জন্য মোটেও সুখকর বিষয় নয়। বর্তমান আইজিপি মহোদয়ের অধীনে আমিও চাকরি করেছি, তিনি তখন চট্টগ্রাম বিভাগের ডিআইজি ছিলেন। বাংলাদেশ পুলিশে যে কজন ঘুষমুক্ত সৎ অফিসার আছেন তিনি তাঁদের

একজন। আশা করি অভিযুক্ত এসআই তার অপরাধের সাজা পাবে।

ঘটনাটা ঢাকা মেট্রো এলাকার। মেট্রো এলাকায় আমিও চাকরি করেছি। তখন দেখেছি পুলিশ রাতের বেলা প্যাট্রোলিং করার সময় সন্দেহজনক লোক দেখলে গ্রেপ্তার করে, এটা অবশ্য পুলিশি কার্যক্রমের মধ্যেই পড়ে। তবে পরোয়ানা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারাসহ আরো যে যে আইনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যায় সেসব আইনের শর্ত অবশ্যই মেনে তা করতে হয়। কারণ কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা মানে সেই ব্যক্তির যেদিকে খুশি যাওয়া বা চলাফেরা করার মৌলিক অধিকার রহিত করেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হয়। সুতরাং এখানে আইনের শর্তসমূহের শীতলতা গ্রহণযোগ্য নয়। মনের ইচ্ছায় বা রাগ-অনুরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সুযোগ নেই। তাছাড়া কোনো ব্যক্তিকে যখন বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হয় তখন উচিত হয় অনতিবিলম্বে তাঁর বিষয়ে তদন্ত সমাপ্ত করা, যাতে নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘদিন আটকের সম্মুখীন না হন। এখন সন্দেহজনকভাবে আটক ব্যক্তিকে জেলে পাঠানোর ১৫ বা ৩০ দিন পর যদি নির্দোষ মর্মে রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাহলে সেই নির্দোষ ব্যক্তির ১৫ বা ৩০ দিন জেলে আটক থাকার দায় কার? নিশ্চয়ই পুলিশের। আইনে যদিও পুলিশকে দায়ী করা যায় না, কিন্তু যিনি আটক ছিলেন তিনি বা তাঁর আত্মীয়স্বজন তো আর পুলিশি তদন্তে আস্থা রাখতে পারবেন না কিছুতেই। আস্থা হারাবে দেশের মানুষও। তাহলে উপায়? উপায় হলো বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা ও তদন্তের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করে আইন প্রণয়ন করা, যাতে নিরীহ লোক হয়রানির শিকার না হয়, দোষী যেন ছাড় না পায়। এ বিষয়ে আরো যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আজ মনে পড়ছে তা হলো, সরকারি দল সব সময় চায় তার বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলে তাদের যেন কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারের এই আচরণও পাল্টানো দরকার। অর্থাৎ বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের আইন যেন বিতর্কিত না হয় কোনোভাবেই।

উপায় হলো বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা ও তদন্তের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করে আইন প্রণয়ন করা, যাতে নিরীহ লোক হয়রানির শিকার না হয়, দোষী যেন ছাড় না পায়।

মেট্রো এলাকায় দেখা যায়, অনেক অফিসার সন্দেহজনক আসামি গ্রেপ্তার করে তাকে থানায় না এনে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে সারারাত ঘুরছে, তারপর সকালে থানায় আসার সময় হলে কিছু ছাড়ছে কিছু রাখছে। এখানে অর্থের বিনিময় মানুষ সরাসরি দেখে এবং প্রকাশ করে। এই অভ্যাস থেকে পুলিশের সরে আসতে হবে। তবে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার যেমন করতে পারে, তেমনি ছাড়তেও পারে। এই ছাড়তে পারার সুযোগটাই পুলিশ খারাপভাবে ব্যবহার করে মাঝে মাঝে। কিন্তু পুলিশ কাউকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেপ্তার করার পর তাৎক্ষণিক তদন্তে যদি পায় যে লোকটি ভালো, সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছিল, সঠিক ঠিকানাও যদি পাওয়া যায় তাহলে পরবর্তী সময়ে যদি প্রয়োজন হয় হাজির হওয়ার মুচলেকা নিয়ে অনতিবিলম্বে ছেড়ে দেওয়াই ভালো, তাহলে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি আর অভিযোগ তুলবে না। আর যদি দ্রুত তদন্ত অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে সেই তদন্তে কোনো লাভ নেই। মানুষ বিরক্ত হবেই। পুলিশের এসআই সিকদার এ কাজটিই করতে চেয়েছিল যে টাকা দিলে ছেড়ে দেবে, না হয় মামলায় দেবে। যে কারণে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিসহ দেশের মানুষ ফুঁসে উঠেছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। পুলিশের যেসব অফিসার এসব কাজ করে তারা এক দিনে বেড়ে ওঠে না। এ ধরনের কাজ করতে করতে তারা বেড়ে ওঠে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তারপর একদিন পুরো বাহিনীর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। থানায় চাকরি করতে করতে এরকম অনেক অফিসার দেখেছি আমি, যাদের দাপটে থানায় অন্যান্য অফিসারের চাকরি করাই দায় হয়ে পড়ে। থানার ওসি যদি এসব বিষয় খেয়াল না রাখেন তাহলে একদিন পাহাড় সমান বিপদ তাঁর মাথার ওপর এসে পড়ে।

অফিসাররা কেন এমন হয়?

দীর্ঘদিন পুলিশে চাকরি করে দেখেছি, পুলিশে কনস্টেবল থেকে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে সৎ ও ভালো লোক হাতে গোনা। নাম বলা যায় মুখস্থ, কারণ সংখ্যা অতি অল্প। পুলিশে চাকরি করলে এরকম একটা ধারণা যদি কাজ করে–বেতনের টাকায় যদি চলতে হয় তাহলে আর পুলিশে চাকরি করা কেন, ৯টা-৫টার একটা সিভিল চাকরি করলেই হয়। আজকাল অবশ্য শুধু পুলিশ কেন, সরকারের সব বিভাগের লোকেরাই অবৈধ আয় করছে দেদার। কিন্তু অন্যদের আয়টা হলো সরকারি টাকার আত্মসাৎ আর পুলিশের টাকাটা আসে সরাসরি পাবলিকের পকেট থেকে। তাই প্রচার পায় সরাসরি।

আবার পুলিশ প্রসঙ্গে আসি। পুলিশের পদোন্নতি থেকে পোস্টিং–কোনো কিছুই বিনা পয়সায় হয় না (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে)। কনস্টেবল থেকে এএসআই, এএসআই থেকে এসআই–সব পদোন্নতিতে অনেক টাকার লেনদেন হয়, ভুক্তভোগীরা তা জানে, জানে তাদের পরিবারের সদস্যরাও। তারপর পোস্টিংয়ের জন্য ব্যয় করতে হয় লাখ লাখ টাকা। পুলিশের সিনিয়র অফিসাররা এই টাকা নেয়। নিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। তারপর সেই অফিসার যখন থানায় যায়, সে তার বিনিয়োগের টাকা উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। পারলে তো পারল, ধরা খাইলে শেষ। সে টাকা যদি ওঠাতে না পারে, সিনিয়র অফিসার তো আর তার টাকা ফেরত দেবে না। সুতরাং রিস্কে থাকে ছোটরাই। আর যদি কেউ ধরা খায় তাহলে বিচারও করে সেই সিনিয়র অফিসারই। এ যেন 'সর্প হইয়া দংশন করে ওঝা হইয়া ঝাড়ে'র মতো কারবার।

আবার এমনও দেখা যায়–অনেক এসপি, ডিআইজি থানা পর্যায়ে পোস্টিংয়ে বা পদোন্নতিতে টাকা নেয় না, কিন্তু বিনা টাকায় পোস্টিং নিয়ে থানায় আসা সেসব অফিসার যে ঘুষ-দুর্নীতিমুক্ত থাকছে তা তো নয়।

অসৎ অফিসার যেভাবে বেড়ে ওঠে

অপরাধপ্রবণ পুলিশ অফিসাররা যেভাবে বেড়ে ওঠে সেটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এরা চাকরিতে প্রবেশ থেকে শুরু করে পদোন্নতি–সবই পায় অস্বচ্ছভাবে। টাকার বিনিময়ে অথবা প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীর মাধ্যমে তারা এসব আদায় করে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে ওইসব অফিসার ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানে না চেইন অব কমান্ডও। পুলিশের কোনো সদস্য যদি এভাবে প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক সুবিধা আদায় করে নিতে পারে, তখন সে বুঝতে পারে তাকে আর ঠেকায় কে? তখন সে জড়িয়ে পড়ে আইনবহির্ভূত নানা কর্মকাণ্ডে। এরাই সেই এসি আকরাম, এরাই সেই এসআই মাসুদ সিকদার। এরাই সেইসব অফিসার, যারা ডিএমপি-ডিবির সোর্সকে মেরে পানির ট্যাংকে ঢুকিয়ে রেখেছিল। এ ধরনের অফিসারের দাপট এখনো পুলিশে কমেছে বলে মনে হয় না, ক্রসফায়ার নামক উদ্ভট ফর্মুলার কারণে মনে হয় আরো বেড়েছে।

মানুষ ক্ষিপ্ত কেন?

দেশের মানুষ মূলত সরকারি সেবাদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপরই খুশি নয়। খুশি থাকার মতো কোনো সেবাও অবশ্য জনগণকে তারা দেয়

না। সীমাবদ্ধতার কারণে দিতে না পারা এবং আন্তরিকতার অভাবে না দেওয়ার পার্থক্য দেশের মানুষ বোঝে। সরকারি সেবা খাতের মধ্যে পুলিশি সেবা এবং চিকিৎসাসেবার ফলাফল জনগণ হাতেনাতে পায়, যা অন্য সেবাসমূহের বেলায় প্রযোজ্য নয়। মানুষ নিতান্ত বিপদের মুহূর্তে পুলিশের থানায় এবং ডাক্তারের হাসপাতালে যায়। এই দুই ক্ষেত্রে যদি মানুষ সেবা না পায়, উপরন্তু দুর্ব্যবহার পায় তাহলে মানুষ সেটা ভোলে না। একজন প্রকৌশলী যখন এক কোটি টাকার ব্রিজ পঞ্চাশ লাখ টাকায় বানিয়ে বাকি টাকা মেরে দেয় সেটা জনগণ সাথে সাথে দেখে না, যখন ব্রিজের ভেঙে পড়া দেখে তখন সময় অনেক বয়ে যায়। পুলিশি সেবা যেহেতু তাৎক্ষণিক বিষয়, সেহেতু মানুষ সেটা সঠিকভাবে না পেতে পেতে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যখন কোনো কারণে বিস্ফোরণ হয় তখন তাদের সেই আগের পুঞ্জীভূত ক্ষোভও তার সাথে যোগ হয়।

যারা অপরাধপ্রবণ

অপরাধপ্রবণ পুলিশ অফিসাররা লেখাপড়া তেমন করে না। বিসিএস অফিসারদের মধ্যে যারা ঘুষপ্রবণ তারাও লেখাপড়ায় তেমন সুবিধার নয়। তবে পরীক্ষা পাসের পড়ালেখা তারা জানে, তার বেশি নয়। আর কেউ কেউ পড়ালেখা জানলেও জনগণের মনোজগতের ভাবনা তারা বোঝে না। আমি পুলিশের এক বিদায় অনুষ্ঠানে বলেছিলাম, কোনো অফিসার যখন বদলি হয়ে আসেন তিনি কয়েক ব্যাগ কাপড়চোপড় এবং এক ব্যাগ জুতা নিয়ে আসেন, কিন্তু নিয়ে আসেন না একটা আইনের বইও। কারণ ব্যাগে জায়গা থাকে না। এটা বড় দুর্ভাগ্য পুলিশের।

অধিকসংখ্যক পুলিশ অফিসার আজ বাইরের অন্যান্য বই দূরে থাক, নিজের প্রয়োজনে আইনের বই পর্যন্ত ভালোভাবে পড়ে না। পড়ে না এজন্য যে ভালো আইন জানা না জানা নিয়ে তো আর ভালো পোস্টিং হবে না, ভালো পোস্টিং পেতে দরকার টাকা আর সরকারদলীয় নেতার সুপারিশ। বিএনপির গত আমল থেকে রীতি চালু হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানার এমপি মহোদয়ের মতামত ছাড়া তাঁর থানায়/উপজেলায় ওসি আর টিএনওর পোস্টিং দেওয়া যাবে না। এই নিয়ম চালু রেখেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও। ফলে দিনে দিনে পুলিশ অফিসাররা হয়ে পড়েছে নেতানির্ভর, আইননির্ভর নয় কোনোভাবেই। আর এই নিয়মকে স্থানীয় এমপি বা এমপি মহোদয়ের ভাইয়েরা ব্যবসা বানিয়ে ফেলেছেন। চট্টগ্রামে এক মন্ত্রীর ভাই তো সিএমপিতে ওসিদের পোস্টিংয়ের বাণিজ্য করত। চাকরিতে থাকতে সে আমাকেও একবার পোস্টিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি রাজি হইনি। এই আইন না-জানা অফিসাররা থানায় নেতার চ্যানেলে আসে, নেতার কথামতো কাজ করে পুলিশের দুর্নাম বাড়ায়। তারপর একসময় ক্ষমতার বদল হলে তারাও বদলে যায়। বদলে গিয়ে নতুন ক্ষমতার নতুন নেতার কাছে তদবিরে যায়। পাল্টে ফেলে আগের খোলস।

> এ ধরনের অফিসারের দাপট এখনো পুলিশে কমেছে বলে মনে হয় না, ক্রসফায়ার নামক উদ্ভট ফর্মুলার কারণে মনে হয় আরো বেড়েছে।

প্রতিটি থানায়ই দু-একজন অপরাধপ্রবণ অফিসার থাকে। এদের যখন সিনিয়র অফিসাররা শনাক্ত করতে না পারে, আর যদি শনাক্ত করতে পেরেও প্রশ্রয় দেয় তখন তারা ফুলেফেঁপে ওঠে। সেই ফুলেফেঁপে ওঠার বিষফল একদিন পুরো পুলিশ বিভাগকেই খেতে হয়। সেই ফুলেফেঁপে ওঠা পুলিশরা হলো এসি আকরাম, দিনাজপুরের সেই পুলিশরা, সোর্সকে মেরে পানির ট্যাংকে ঢুকিয়ে রাখা অফিসাররা এবং সদ্য পাওয়া গেল এসআই মাসুদ সিকদারকে।

ক্ষতিকর সোর্স

একসময় পুলিশের তথ্য প্রদানকারী ভালো সোর্স এখন আর নেই। এখন যেসব সোর্স থানায় দেখা যায় সবাই ধান্দাবাজ, মতলববাজ। থানায় যেসব অফিসার টাকা আয়ের ধান্দায় থাকে ওদের পেছনে এইসব সোর্স ঘোরাফেরা করে। এরা অপরাধী গ্রেপ্তারের খবর আনে না, আনে কোন কাজে আয় হবে সেইসব খবর। তাছাড়া যেহেতু তারা এলাকার লোক, ওদের সাথে যদি কারো সম্পর্ক খারাপ থাকে তাহলে তারা সেই লোককে অপরাধী পরিচয় দিয়ে থানায় গ্রেপ্তার করায়। নির্যাতন করার পাঁয়তারা করে অফিসারকে নানা কথা বোঝায়। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার গ্রেপ্তারের পেছনেও সে রকম কোনো বাজে সোর্সের কারসাজি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কথা হলো, যে পুলিশ অফিসার সোর্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই না করে কাউকে গ্রেপ্তার করে ফেলে সেই অফিসার দক্ষ কোনো অফিসারই নয়। তার তথ্য মূল্যায়নের কোনো ক্ষমতাই নেই। এসআই মাসুদের বিষয়ে যাঁরা তদন্ত করছেন তাঁদের এই দিকটাও খেয়াল রাখা দরকার।

শেষ কথা

রাত্রিকালে প্যাট্রোলিং করার সময় পুলিশের নজরে যদি কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি পড়ে তাহলে তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে, রাত্রিকালে ঘোরাফেরা করার কারণও জানতে চাওয়া যেতে পারে এবং জবাব যদি সন্তোষজনক না হয় কার্যবিধির ৫৪ ধারা মতে গ্রেপ্তারও করা যেতে পারে। কিন্তু যদি জানা যায় তিনি টিভিতে খবর পড়েন, বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করেন তাহলে তো সেই ব্যক্তিকে আর গ্রেপ্তারের কারণ থাকে না। তার পরও যদি সন্দেহ থেকেই যায় তাহলে গ্রেপ্তারের পর দ্রুত তদন্ত শেষ করে সেই ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া জরুরি। এখানে গোলাম রাব্বীর বিষয়ে সেটা করা হয়নি, যদি করা হতো এত কথা আর উঠত না। শুধু তা-ই নয়, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ইয়াবা ব্যবসায়ী বানিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ, যা পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। এসব অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে ওই এসআইর পুলিশে চাকরি করার অধিকার থাকে না। শুধু তা-ই নয়, দেশের একজন নাগরিককে অন্যায় আটকের জন্য তার সাজা হওয়াও প্রয়োজন।

সব শেষে বলব, এসব অসৎ অফিসার তৈরির পথ বন্ধ করতে হলে সিনিয়র অফিসারদের পদোন্নতি বাণিজ্য, পোস্টিং বাণিজ্য বন্ধ করা দরকার। না হয় পোস্টিংয়ের জন্য অগ্রিম টাকা নিয়ে সেই অফিসারকে সৎ হতে বলা অর্থহীন। সরকার যখন পুলিশের সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়িয়েছে, তখন পুলিশেরও দরকার সেই প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতিদান দেওয়া। থানায় থানায় এমপি/মন্ত্রীর মনোনীত পুলিশ অফিসার বাদ দিয়ে সিনিয়র অফিসারদের জানা মতে ভালো ও যোগ্য অফিসারদের নিয়োগ দেওয়াও আজ জরুরি।

সনতোষ বড়ুয়া: সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশ। কবি, ছড়াকার ও গল্পকার
ই-মেইল: sbarua63@gmail.com